ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-3 পত্র— ‘প্রাগাধুনিক সাহিত্য-১’-এর মডিউল-১-এর পঠিত বিষয়—

চর্যাপদ / চর্যাগীতি— ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত; নির্বাচিত পদসমূহ— ১, ৫, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৭, ২৮, ৩০, ৪০, ৪৯, ৫০।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় প্রদান। এখানে চর্যাগীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে চর্যাগীতি সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়গুলি হল—

- চর্যাপদের সাধারণ পরিচয়— আবিষ্কার, প্রকাশ ইত্যাদির পরিচয়
- চর্যাপদের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থের নামকরণ বিষয়ে বিতর্ক
- চর্যাগীতির বিভিন্ন কবিদের নাম ও পদের তালিকা
- বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের ধারায় সহজযান ধর্মমতের উদ্ভব ও বিকাশ
- বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনতত্ত্ব ও রূপকতত্ত্বের পরিচয়
- চর্যাগীতির ভাষা বিষয়ক বিতর্ক
- চর্যাগীতিগুলিতে প্রতিফলিত তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজচিত্র
- চর্যাগীতির সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য
- চর্যাগীতিতে বর্ণিত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনপন্থায় ‘সদ্গুরুর’ ভূমিকা
- চর্যাগীতিগুলিতে উপমা-রূপক-চিত্রকল্প সৃজনে পদকর্তাদের কৃতিত্ব

— উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের বিস্তারিত জানার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’, সুকুমার সেন সম্পাদিত ‘চর্যাগীতিপদাবলী’, নির্মল দাশের ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,

আশুতোষ

কলেজ।

চর্যাপদ

চর্যাপদের সাধারণ পরিচয় ও নামকরণ –

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩ - ১৯৩১) বাংলা পুথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপালে যান। সেখানে তিনি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব এই চারটি পুথি সংগ্রহ করেন। ১৩২৩ সালের (১৯১৬ খ্রিঃ) শ্রাবণ মাসে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে চারখানি গ্রন্থ একত্রে ''হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

পুথি প্রকাশের মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন – ''১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়। উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহারে সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ।'' অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা ছিল গানগুলির নাম 'চর্য্যাপদ'। গানের পুথিটির নাম 'চর্য্যাচয্য বিনিশ্চয়'।

পরবর্তীকালে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় চর্যাপদগুলি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত তথ্য পরিবর্তিত হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় ধারণা করেছিলেন প্রাপ্ত পুথিখানিই মূল গীতি সংগ্রহের। কিন্তু বস্তুত পুথিটি ছিল গীতি সংগ্রহের টীকার। টীকা রচয়িতার নাম মুনিদত্ত। মুনিদত্ত কৃত এই সংস্কৃত টীকার কীর্তিচন্দ্র কৃত একটি তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে। এই তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সংবাদ দেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তা অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন।

মুনিদত্ত যে সংস্কৃত টীকা রচনা করেন তার নাম দেন 'চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়'। লিপিকর প্রমাদে নামটি দাঁড়ায় চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়। ড. বাগচী মহাশয় তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক করেন, শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত – চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়।

প্রাপ্ত পুথিখানিতে গীতি ও টীকা একসাথে থাকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা হয়েছিল পুথিখানি মূলগীতির এবং তার সঙ্গে টীকা সংযোজিত হয়েছে এবং মূল গীতিসংগ্রহটির নাম 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'। তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কারের পর এই ধারণা দূরীভূত হয়েছে এবং জানা গিয়েছে ঐ নামটি টীকার, মূলের নয়।

তাহলে প্রশ্ন ঃ মূলের নাম কী ? ড. সুকুমার সেনের মতে মূল চর্যাগীতি সংগ্রহ গ্রন্থখানির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। বৃত্তি লেখক বৃত্তির নামেই পুথিটির নাম করেছিলেন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। পরবর্তীকালে লিপিকর ভুল করে লিখেছেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'।

চর্য্য অর্থাৎ আচরণীয় এবং অচর্য্য অর্থাৎ অনাচরণীয়। কীভাবে সাধনা করলে সিদ্ধি (নির্বাণ) লাভ হবে এবং তার জন্য কী নিয়ম-কানুন গ্রহণ ও বর্জন করতে হবে – এ সম্পর্কে চর্যায় স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধ নিয়ে পদগুলি রচিত। তাই চর্যাপদগুলিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দেওয়া 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়' নামেই অভিহিত করা যায়। এবং মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই নামই নির্ভুল মনে করেন।

চর্যাপদের রচনাকাল –

একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, চর্যাগীতিগুলি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কোন্ সময়ে চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়েছিল তা আজও নির্ণয় করা যায় নি। পণ্ডিত মহলেও বিতর্কের অবসান ঘটেনি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিগণের মতে চর্যার রচনাকাল খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ''বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে গোপীচাঁদের সময় নির্দেশ করেছেন একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত ক'রে তিরুমলয়ের শিলালিপিতে তাঁর জয়গান উৎকীর্ণ করেন (১০২১ খ্রিঃ)। গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণ দেশের রাজার যুদ্ধবিগ্রহের কথা ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ময়নামতীর গানেও উল্লেখ করা আছে। এই গোবিন্দচন্দ্রকেই দীনেশচন্দ্র সেন নাথগীতিকার গোপীচাঁদ মনে করেন। গোপীচাঁদের দীক্ষাগুরু জালন্ধরী পা (হাড়িপা) আর জালন্ধরী পা-র শিষ্য চর্যাগীতির অন্যতম রচয়িতা কাহ্নপাদ (কানুপা)। কাজেই গোপীচাঁদ এবং কানুপা সমসাময়িক। সুতরাং কানুপার সময়ও একাদশ শতাব্দীতে ধরতে হয়।

ড. সুকুমার সেন তাঁর ''বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে চর্যার রচয়িতাদের সাহিত্য সাধনার সময় সাধারণভাবে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্বীকার করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ''বাংলা সাহিত্যের কথা'' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে যুক্তি তর্ক সহকারে চর্যাপদের সময় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্দেশ করেন। শহীদুল্লাহর মতে মীননাথ চর্যার আদি গুরু। সপ্তম শতাব্দীতে মীননাথের অবস্থান ও কাব্য রচনাকাল বলে তিনি মনে করেন।

শ্রী সত্যব্রত দে মহাশয় তাঁর ''চর্যাগীতি পরিচয়'' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০) গ্রন্থে চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে 'একটি বাহ্য প্রমাণ' দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে চর্যাগীতিগুলি সুরতাল সংযোগে গাওয়া হত। রাগরাগিনীর উল্লেখ গীতিগুলিতেই আছে। সুতরাং সমসাময়িক যুগের সঙ্গীত গ্রন্থে চর্যাগীতির উল্লেখ সন্ধান করা উচিত। প্রাচীন বাংলার দু'খানি সঙ্গীত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া

গিয়েছে। লোচনের ‘রাগতরঙ্গিনী’ এবং শার্ঙ্গদেবের ‘সঙ্গীতরত্নাকর’। ‘সঙ্গীতরত্নাকরে’র রচনাকাল ১২১০-৪৭ খ্রিস্টাব্দ; ‘রাগতরঙ্গিনী’ আরও প্রাচীন। ‘রাগতরঙ্গিনী’তে চর্যাপদের উল্লেখ নেই। ‘সঙ্গীতরত্নাকরে’ এর বিস্তৃত উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেব ‘সঙ্গীতরত্নাকরে’ ‘প্রবন্ধ’ অধ্যায়ে চর্যার বর্ণনা করেছেন –

> পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দা ঃ পাদান্ত প্রাস শোভিতাঃ।
> অধ্যাত্ম গোচরা চর্য্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়াদি তালতঃ।।
> (শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রণীত ‘বাংলার সঙ্গীত’ ১ম খণ্ড , পৃ. ৪৫ দ্রঃ)

– ঐ ‘চর্য্যা’ আমাদের আলোচ্য চর্যাগীতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলোচ্য চর্যাপদগুলিও ‘পদ্ধড়ী’ অর্থাৎ পজ্ঝটিকা ছন্দে, পাদান্ত্যনুপ্রাস যুক্ত চরণে গঠিত এবং অধ্যাত্বগোচরা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ক। সুতরাং ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে লিখিত গ্রন্থে চর্যাপদের যখন বিস্তৃত উল্লেখ আছে তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে চর্যাগীতিগুলি তার বহুপূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল এবং বেশ পরিচিতই ছিল। শ্রী সত্যব্রত দে মহাশয় এই প্রমাণ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে চর্যাগীতিগুলি দ্বাদশ শতকের মধ্যেই রচিত ও প্রচারিত।

চর্যাপদ রচনার নির্দিষ্ট সন তারিখ কিছু উল্লেখ করতে না পারলেও, সমালোচক-পণ্ডিতদের বক্তব্য অনুসারে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, চর্যাপদগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

পদ সংখ্যা ঃ পদকর্তা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৪৬টি পূর্ণ পদ আর একটি পদের কিয়দংশ সংগ্রহ করেছিলেন। পুথি খণ্ডিত ছিল। পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতী অনুবাদ থেকে খণ্ডিত পদটি এবং আরও কয়েকটি পদ উদ্ধার করেন। এইভাবে চর্যার সংখ্যা হয় ৫০টি।

চর্যাগীতিতে ভণিতা করবার রীতি ছিল। মুনিদত্তও টীকাতে রচয়িতার নাম উল্লেখ করেছেন। সব মিলিয়ে মোট ২৩ জন পদকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে পদকর্তাদের নাম, মোট পদ সংখ্যা এবং রচিত পদগুলির ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করা হল ঃ

	পদকর্তা	মোট পদ সংখ্যা	পদের ক্রমিক সংখ্যা
১।	লুইপাদ	২	১, ২৯
২।	কুক্কুরীপাদ	৩	২, ২০, * ৪৮
৩।	শান্তিপাদ	২	১৫, ২৬
৪।	শবরপাদ	২	২৮, ৫০
৫।	দারিকপাদ	১	৩৪
৬।	বিরুঅপাদ	১	৩
৭।	গুণ্ডরীপাদ	১	৪
৮।	চাটিলপাদ	১	৫
৯।	কম্বলাম্বরপাদ	১	৮
১০।	ডোম্বীপাদ	১	১৪
১১।	মহীধরপাদ	১	১৬
১২।	বীণাপাদ	১	১৭
১৩।	আর্যদেবপাদ	১	৩১
১৪।	ঢেন্ঢনপাদ	১	৩৩
১৫।	ভদ্রপাদ	১	৩৫
১৬।	তাড়কপাদ	১	৩৭
১৭।	কঙ্কণপাদ	১	৪৪
১৮।	জয়নন্দীপাদ	১	৪৬
১৯।	ধামপাদ	১	৪৭
২০।	সরহপাদ	৪	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯
২১।	ভুসুকুপাদ	৮	৬, ২১, * ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯
২২।	কাহ্নপাদ	১৩	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, *২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫
২৩	তন্ত্রীপাদ	১	* ২৫

[* চিহ্নিত পদগুলি পূর্ণত বা আংশিকভাবে মূল পুথির কয়েকটি পৃষ্ঠা নষ্ট হওয়ায় তিব্বতী অনুবাদ হতে অনুমিত।]

চর্যাপদের ধর্মমত, সাধনতত্ত্ব ও রূপকতত্ত্ব –

চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধন সঙ্কেত। তাঁদের সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য পরম নির্বাণ বা পার্থিব জন্ম-মৃত্যু থেকে চিরন্তন মুক্তিলাভ। মানুষ নানা প্রকার কামনা-বাসনার দাস হয়ে জাগতিক জীবনকেই সর্বস্ব মনে করে এবং পার্থিব ভোগসুখে মত্ত থাকে। এই পার্থিব মোহ বা অবিদ্যাই মানুষকে ক্রমাগত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে (ভবচক্র) আবর্তিত করায়। মানুষ বারবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে আর রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা বেদনার্ত হয়।

এই বারবার জন্মগ্রহণ থেকে মুক্তি পেতে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নির্বাণ লাভের উপরেই প্রাধান্য দিয়েছেন। পার্থিব মায়া-মোহ, কামনা-বাসনা ত্যাগ ক'রে, মনকে শূন্য (নিষ্কাম) ক'রে পরম নির্বাণ লাভের ব্যাপারে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বেশ মিল রয়েছে। নির্বাণ উভয় ধর্মেরই কাম্য কিন্তু নির্বাণ লাভের উপায় নিয়ে মতভেদ আছে। হিন্দু দার্শনিকদের বিশ্বাস পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার উদ্ভব। পরমাত্মা নানারূপ মায়াজাল বিস্তার ক'রে জীবাত্মাকে মোহ-মুগ্ধ করে রাখেন – এও তাঁর এক অপরূপ লীলা। এই মোহ-জনিত অবিদ্যা জীবজগতকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে, জীব দুঃখ-সাগরে হাবুডুবু খায়।

যিনি এই মায়া-আবরণ ছিন্ন করতে পারেন, তিনি জগতকে মিথ্যা এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই (পরমাত্মা) সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারেন, পরমাত্মার সত্তায় নিজেকে বিলীন করে দিতে পারেন। ভবচক্রের আবর্তন থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ভবচক্রকে বিশ্বাস করেন। অবিদ্যাজনিত দুঃখ-কষ্টও তাঁরা স্বীকার করেন। এবং তার থেকে মুক্তিলাভের প্রাণপণ চেষ্টাও তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা যায় কিন্তু ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কল্পনা তাঁরা স্বীকার করেন না। পরমাত্মায় জীবাত্মা বিলীন হয়ে যায় এ বিশ্বাস তাঁদের নেই।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের কিছুকাল পরেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়। রাজগৃহ, বৈশালী, পাটলিপুত্র ও পুরুষপুরে চারটি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয় এবং বুদ্ধ প্রবর্তিত মত ও পথের ভাষ্যদান করা হয়। এই সকল তর্ক-বিতর্ককে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ মতাবলম্বীগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হন। প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল দলকে বলা হয় হীনযানী এবং অপেক্ষাকৃত উদার ও প্রগতিশীল দল মহাযানী বলে আখ্যাত হয়।

হীনযানীরা ব্যক্তিগত মুক্তির সংকীর্ণ গণ্ডীতে ধ্যান-ধারণা, নৈতিক আচার-আচরণ এবং কঠোর সাধনার পথ বেছে নিলেন। এই পথেই শূন্যতার সাধনায় নিজের মনের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে মহাযানীরা নির্বাণ লাভ অপেক্ষা বুদ্ধত্বলাভের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যক্তিগত মুক্তির চাইতে তাঁরা প্রাধান্য দিলেন বিশ্বমানবের দুঃখ-মুক্তির উপর। একেই 'করুণা' বলা হয়েছে। শূন্যতার সঙ্গে করুণার মিশ্রণেই বোধিচিত্তের উদ্ভব হয়। এটাই মহাযানীদের নিকট বুদ্ধত্ব লাভ। মতবাদের সংকীর্ণতা ও নৈতিক শাসনের প্রচণ্ডতা হীনযানী মতবাদকে জনপ্রিয় করেনি। কিন্তু মহাযানীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি মহাযানী মতকে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

এই সময় থেকেই বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিক প্রভাব পড়তে শুরু করে। কারণ মহাযানী মতের উদারতায় অনেক পার্বত্য ও আরণ্যক আদিবাসী সমাজের মানুষও এই ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। এই জাতি দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব এড়িয়ে পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে তাদের সহজ সরল স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। ভূত-প্রেতিনী, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি অলৌকিক সত্তায় এবং মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাবের উপর তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তারা যখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হল তখন তাদের এই তান্ত্রিক প্রভাব তারা বর্জন করতে পারেনি।

এই কারণেই নানা শ্রেণির লৌকিক মতবাদও মহাযানের মধ্যে প্রবেশ করল। ফলে মহাযান মতের আরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এদের মধ্যে একদল হল বজ্রযান। বজ্রযানীদের মতে নির্বাণের পরে আরও তিনটি অবস্থা – শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতার পরম জ্ঞানকে মহাযানী মতে বলা হয় বোধিচিত্ত। বজ্রযানীরা মনে করে, সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি দমন করতে পারলে বোধিচিত্ত বজ্রের মত কঠিন হয়। বজ্রযানে গুরুর প্রাধান্য। গুরু-প্রদর্শিত পথে সাধনা করলেই বোধি লাভ সম্ভব।

চর্যার সাধনতত্ত্ব –

বজ্রযানের বিবর্তিত রূপ সহজযান। সহজযানীরা মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তাদের মতে করুণা পুরুষ এবং শূন্য প্রকৃতি। করুণা ও শূন্যতার মিলনে একপ্রকার সুখ অনুভূত হয় যাকে এরা মহাসুখ (মহাসুহ) বলে আখ্যায়িত করে। মহাসুখের অনুভূতি জন্মালে সমস্ত ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য জপতপ, ধ্যান-ধারণা বা আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। সহজ আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে মহাসুখে মগ্ন হয় বলেই এদের সহজিয়া বলা হয়। সহজিয়াদের মতে তাদের অনুসৃত পথই সোজাপথ।

সহজযানীদের দেহবাদ বা দেহ সাধনা (কায়া সাধন) প্রধান লক্ষ্য। এদের মতে দেহই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ। দেহভাণ্ডকে জানলেই ব্রহ্মাণ্ড জানা যাবে। তাই দেহ সাধনার মাধ্যমেই এরা নির্বাণ লাভে প্রয়াসী হয়েছেন। কায়া সাধন পদ্ধতিতে দেখা যায় এরা দেহের অভ্যন্তরে তিনটি নাড়ী ও সাতটি পদ্মের উল্লেখ করেছেন। নাড়ী তিনটির সাধারণ নাম ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদে এই নাড়ীগুলির বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। ইড়া-পিঙ্গলার নাম যথাক্রমে আলি-কালি, চন্দ্র-সূর্য, গঙ্গা-যমুনা, ধমন-চমন, কুলিশ-কলম, বিন্দু-নাদ, ভব-নির্মাণ, লালন-রসনা প্রভৃতি। সুষুম্নার নাম অবধূতি, অবধূতিকা, মধ্যগা প্রভৃতি। এছাড়া সাধন সংকেতের মধ্যে আট কুঠুরী, নয় দরজা প্রভৃতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

মেরুদণ্ডের বাম এবং দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে ইড়া ও পিঙ্গলা এবং অভ্যন্তর দিয়ে সুষুন্না প্রবাহিত। এই সুষুন্না নাড়ীর সঙ্গে যোগ রয়েছে চিত্রিনী এবং ব্রহ্মনাড়ীর। এই নাড়ী মস্তকে অবস্থিত সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নাড়ীর সঙ্গে মাল্যাকারে গাথা আছে ছয়টি পদ্ম (ষটচক্র)। সুষুন্না নাড়ীর অগ্রভাগে গুহ্যদেশে অবস্থিত মূলাধার পদ্ম, এই পদ্মেই কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করে। লিঙ্গমূলের পদ্মকে স্বাধিষ্ঠান, নাভিপদ্মকে মণিপুর, হৃদয়পদ্মকে অনাহত, কণ্ঠপদ্মকে বিশুদ্ধ এবং ভ্রূমধ্যে অবস্থিত পদ্মকে আজ্ঞাপদ্ম বলা হয়। গুরু প্রদর্শিত নিয়মাদির অনুসরণে সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। তারপর কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রদলে অবস্থিত পরম শিবের সহিত মিলাতে হবে। শিবের সহিত মিলনে পরিতৃপ্ত কুণ্ডলিনীকে আবার মূলাধার পদ্মে প্রত্যাবর্তন করাতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে আর একটি সাধন পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতিতে দেহমধ্যে চারটি চক্রের উল্লেখ রয়েছে। নাভিতে নির্মাণচক্র, হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগচক্র এবং মস্তকে উষ্ণীষ বা সহজচক্র। একে মহাসুখচক্রও বলা হয়। মস্তকে চন্দ্র এবং নাভিমূলে সূর্য অবস্থিত। ইড়া ও পিঙ্গলা এই নিম্নগামী নাড়ীদ্বয় চন্দ্র থেকে ক্ষরিত সুধাধারা বহন করে নাভীর দিকে গমন করে। নাভিতে অবস্থিত সূর্য এই সুধাধারা শোষণ করে ফেলে। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের স্বাভাবিক নিম্নগামী সুধাধারা যোগ সাধনার দ্বারা রুদ্ধ করে মিলিত করাতে হবে। তারপর সুষুন্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে ঐ মিলিত রসধারা উর্ধ্বগামী করতে হবে। এই উর্ধ্বগামী ধারাই হল আনন্দধারা। এই ধারা যত উর্ধ্বগামী হবে আনন্দের গভীরতা ততই বৃদ্ধি পাবে। প্রথম স্তর অর্থাৎ নির্মাণচক্র অতিক্রম করলে এর নাম প্রথমানন্দ, ধর্মচক্র অতিক্রম করলে পরমানন্দ, সম্ভোগচক্র অতিক্রম করলে যে আনন্দ হয় তার নাম বিরমানন্দ এবং মহাসুখচক্রে উপনীত হলে এই আনন্দানুভূতিকে সহজানন্দ বলা হয়। এই সহজানন্দ লাভেই সহজযানী সাধকদের সাধনার সার্থকতা।

হীনযান, মহাযান এবং মহাযানের বিবর্তিত রূপ—বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি ছাড়াও আর এক প্রকার যান বা সাধন পদ্ধতির সন্ধান চর্যাপদে পাওয়া যায়। তাকে কালচক্রযান বলা হয়। কালচক্রে সবই আবর্তিত হচ্ছে তাই কালচক্রের ঘূর্ণনেই মানুষের বারংবার জন্ম এবং সেই কারণে দুঃখ-কষ্ট, জরা-মৃত্যু ভোগ। সাধনার দ্বারা নিজেকে কালচক্রের প্রভাব-মুক্ত করতে পারলেই নির্বাণ লাভ হয়। যোগাভ্যাস দ্বারা দেহের নাড়ীগুলিকে নিশ্চল করে দৈহিক প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারলেই কালের প্রভাব এড়ানো যায়। কালকে প্রাধান্য দেওয়ায় এই সাধন পদ্ধতিতে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, তিথি, বার প্রভৃতির প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। চর্যাপদে শুধু সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের সাধনার কথাই নেই, এগুলির মধ্যে বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি সকল যানেরই সাধন পদ্ধতির ইঙ্গিত রয়েছে।

চর্যাপদগুলিকে সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করলেও এর মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশই সিদ্ধাচার্যগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল। চর্যাগুলি সাধারণের বোধগম্য করবার জন্য যদিও সাধকগণ পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং জীবন থেকে উপমা, রূপক প্রভৃতির সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তত্ত্ব যে অত্যন্ত জটিল এবং সাধন পদ্ধতি যে দুরূহ তা সিদ্ধাচার্যগণ নিজেরাও অনুভব করেছিলেন।

নির্বাণ, সহজানন্দ বা মহাসুখ যে কেমন তা অনুভব করা এবং প্রকাশ করা কঠিন। বোঝা কঠিনতর। লুইপা নিজেই তাঁর একটি পদে নির্বাণতত্ত্বের দুর্বোধ্যতার কথা বলেছেন -

“জাহের বান চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেত্রঁ বখানী।।
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।।
লুই ভণই ভাইব কীস।
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস।।”
(২৯ সংখ্যক চর্যা)

— যার বর্ণ-রূপ-চিহ্ন কিছুই জানা যায় না তা আগম বা বেদের দ্বারা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? (আমি) কাকে কী বলে পরিচয় দেব! জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ সত্য না মিথ্যা? লুইপা বলছেন আমি কী ভাববো? যা নিয়ে আছি তারই উদ্দেশ পাই না।

সাধনা এবং নির্বাণ সম্পর্কে চর্যাকারগণ এত হেঁয়ালি সৃষ্টি করেছেন যে সাধারণের বুদ্ধির অগম্য করে তুলেছেন। চর্যাকারগণও অবশ্য বুঝেছেন এগুলি সাধারণের বোধগম্য নয়। ঢেন্ঢনপাদের একটি চর্যা হেঁয়ালিতে পরিপূর্ণঃ

“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।....

নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই।

ঢেন্ঢন পা এর গীত বিরলেঁ বুঝই।।”

(৩৩ সংখ্যক চর্যা)

— টিলার উপরে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই তবুও অতিথির নিত্য আনাগোনা। ঢেন্ঢন পাদের গান খুব কম লোকেই বোঝে। অবশ্য কম লোকেরই বোঝার কথা। রূপকের খোলস উন্মোচন করলে আরেকটি অর্থ (প্রথম দু’লাইনের) — টিলার

উপরে ঘর অর্থাৎ মহাসুখচক্র বা সহস্রদল পদ্ম মস্তকে অবস্থিত। মহাসুখচক্রে সহজানন্দ ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই তাই সে স্থান প্রতিবেশীহীন। হাড়িতে ভাত নেই অর্থাৎ দেহের মধ্যে চিত্ত নেই তবুও নৈরাত্মারূপ অতিথি সেখানে প্রতিদিনই ভীড় করছে।

আবার কোথাও কোথাও চর্যাপদগুলিকে সর্বজনবোধ্য করে তোলবার চেষ্টায় চর্যাকারগণ সাধারণের পরিচিত প্রকৃতি, জীবন ও সমাজ থেকে বহু উপমা বেছে নিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতীক রূপে এগুলিকে গ্রহণ করেছেন। লুইপা দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন – 'কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল' (১ সংখ্যক চর্যা)। অর্থাৎ দেহ হল একটি বৃক্ষ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার পঞ্চশাখা। কানুপা-র একটি পদে দেখা যায় বৃক্ষকে মনের প্রতীকরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন ঃ-

''মন তরু পাঞ্চ ইন্দ্রি তসু সাহা।
আশা বহল পাত ফল বাহা।।''
(৪৫ সংখ্যক)

– মন বৃক্ষ, পাঁচটি ইন্দ্রিয় শাখা। সে (আশারূপ) বহু পাতা ও ফল বহন করে।

সাধন পদ্ধতির দুরূহ তত্ত্বকে সাধারণের বোধগম্য করে তোলবার জন্যই চর্যাকারগণ সাধারণের পরিচিত জগৎ ও জীবন থেকে উপমা ও রূপক গ্রহণ করেছেন। এই উপমা ও রূপক সৃষ্টিতে চর্যাকারগণের বাস্তবমুখিনতার পরিচয় রয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা ঃ 'সন্ধ্যা ভাষা' না 'সন্ধা ভাষা'

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগুলিকে হাজার বছরের পুরানো বাংলা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর ''হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'' গ্রন্থে বলেছেন – ''আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক।'' ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ''Origin and Development of the Bengali Language'' গ্রন্থে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা বলেই প্রমাণিত করেছেন।

চর্যাগানের টীকাকার মুনিদত্ত চর্যায় ব্যবহৃত শব্দগুলির দু'রকম অর্থের সন্ধান দিয়েছেন – একটি বাহ্যিক, অন্যটি গূঢ় বা অভ্যন্তরীণ। এই দ্ব্যর্থ শব্দ রীতিকে 'সন্ধ্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুনিদত্তের টীকা অনুসরণ করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এটিকে 'সন্ধ্যা' ভাষায় লেখা বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি 'সন্ধ্যা ভাষা'র অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন –

''সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা,
কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা
যায়, খানিক বুঝা যায় না।''
(হা. ব. পু. বা.ভা.বৌ. দো., পৃ. ৮, ভূমিকা অংশ)

অর্থাৎ তিনি 'সন্ধ্যা' অর্থে এই ভাষার সঙ্গে 'সন্ধ্যা'র নৈসর্গিক অস্ফুটতার সাদৃশ্যের কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ-ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে, 'সন্ধ্যা' বানানটি লিপিকরের প্রমাদ, প্রকৃত বানান 'সন্ধা'; 'সম্' - ধাতু থেকে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি। ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, বিধুশেখর মহাশয়ের এই মতকে সমর্থন করেছেন।

যুক্তির দিক থেকে বিধুশেখর ও প্রবোধচন্দ্রের 'সন্ধা' বানানটি গ্রহণযোগ্য হলেও, পুথিতে প্রাপ্ত 'সন্ধ্যা' (টীকা ৫০ - 'তল্লগ্নবাটীকা সন্ধ্যায়া তৃতীয় মহাশূন্য চ') বানানটিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয় এবং ঐ বানানকে ঠিক লিপিকরের প্রমাদ বলা চলে না। কারণ 'সন্ধ্যাভাষা' আসলে গূঢ়ার্থ প্রতিপাদক এক ধরনের বচন-সংকেত। যেখানে অভীষ্ট বক্তব্যকে সাধারণের অগোচরে রেখে প্রকাশ করার দরকার হয়, সেখানে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে ধর্মচর্যায় যখনই গোপনীয়তার দরকার হত, তখনই ধর্মগুরুগণ এই ধরনের সাংকেতিক বচনের মাধ্যমে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের শিষ্যদের সঙ্গে তত্ত্বালাপ করতেন।

অতএব, চর্যার গানগুলি 'সন্ধ্যা ভাষায়' রচিত, যার মধ্যে দু'রকম অর্থ বর্তমান। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা তাদের সাধন প্রণালীর সুবিধার জন্য চর্যার মধ্য দিয়ে রূপকের ব্যবহার করতেন। আর প্রাচীন কবি (লুই) অপেক্ষা অর্বাচীন কবিদের (যেমন ভুসুকু) রচনায় এই রূপক ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

চর্যাপদে সমাজচিত্র / লৌকিক জগৎ / সমকালীন বাংলাদেশ ঃ

মানুষের জীবন ও সমাজচিত্র অঙ্কন সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। সাহিত্যের মাধ্যমে যুগমানস ও যুগচেতনা মূর্ত হয়ে ওঠে। তবে আধুনিক যুগের সাহিত্যে সমাজ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন যুগের সাহিত্যে সেভাবে আশা করা যায় না। আধুনিক সাহিত্যে মানবজীবন ও মানবসমাজই প্রাধান্য লাভ করে। যেহেতু জীবন সমাজ কেন্দ্রীক এবং সাহিত্য জীবনভিত্তিক, কাজেই সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বিশেষ করে 'চণ্ডীমঙ্গলে' কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চর্যাপদে সমাজ প্রত্যক্ষ নয়। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সাধনার মূলমন্ত্র লোক সমক্ষে প্রকাশ না

করা। তারপরেও এগুলিকে সর্বজনবোধ্য করে তোলবার জন্য লৌকিক সমাজের মধ্য থেকে নানাবিধ উপমা ও উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। তাই পরোক্ষভাবে স্থানে স্থানে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো সমাজচিত্র একত্রিত করলে তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি উদ্ধার করা যায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগের সাহিত্যসাধনার মধ্যে অতি সাধারণ মেহনতী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন ও সমাজ সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। এর কারণ সিদ্ধাচার্যরা অনেকেই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে মীননাথ জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত, শবরী পা ছিলেন শিকারী। মহীধর ছিলেন শূদ্র জাতির। বুদ্ধদেব যেমন তাঁর বাণী সর্বসাধারণে প্রচার করতে চেষ্টা করেন এবং নির্দেশ দেন, এই সিদ্ধাচার্যরাও সেরূপ তাঁদের বাণী আপামর জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। কাজেই সাধারণ মেহনতী মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সমাজ থেকে নানারূপ উপমা উদাহরণ দিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের মর্মবাণী বোধগম্য করে তোলবার সাধনা করেছেন। তাই তাঁদের সমাজই তাঁদের কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে।

চর্যাপদের মধ্যে পাওয়া যায় সাধারণ মেহনতী মানুষের অতি সরল, সহজ জীবনযাত্রার চিত্র। ৩৩-সংখ্যক চর্যায় পাওয়া যায় –

> ‘‘টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
> হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।’’

– অর্থাৎ টিলার উপরে ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্যই অতিথির আনাগোনা। এই পদের গুহ্য অর্থ যাই হোক-না-কেন বাহ্য অর্থ দৈনন্দিন জীবনের অভাব অনটন।

কৃষি তৎকালীন জীবিকার্জনের প্রধান উপায় ছিল। তাছাড়া হরিণ শিকার, মৎস্য শিকার, নৌকা বাওয়া এবং নৌকায় জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য করা, চাঙাড়ী বোনা, মদ তৈরি এবং বিক্রয় করা প্রভৃতিও জীবিকার উপায় হিসেবে গণ্য করা হত। কৃষিকার্যের জন্য গো-পালন নিত্যনৈমিত্তিক বৃত্তি ছিল। বলদ দিয়ে হাল চাষ হত, গাভী পালন করা হত দুধের জন্য। দুগ্ধ দোহন প্রক্রিয়া সে যুগের মানুষের জানা ছিল। দুগ্ধ দোহনের পাত্রকে পীঠা বলা হতো। দুধ থেকে মাখন তোলার পদ্ধতি তাদের অজানা ছিল না।

জাল দিয়ে মাছ ধরবার কথাও চর্যাপদে জানা যায়। তবে হরিণ শিকারকেই শিকারের মধ্যে প্রাধ্যন্য দেওয়া হয়েছে। পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির মধ্যে হরিণের মাংসই অতি প্রিয় ছিল। একটি গুহ্য তত্ত্বকে সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ হরিণ শিকারের উপমা দিয়ে প্রকাশ করেছেন–

> ‘‘তিণ ন ছুবই হরিণা পিবই না পাণী।
> হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।।’’
> (৬ -সংখ্যক চর্যা)

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা চলাচল, খেয়া পারাবার প্রভৃতিকে রূপক রূপে চর্যাকারগণ কয়েকটি চর্যায় ব্যবহার করেছেন। দেহকে নৌকা করে ভবনদী পার হওয়ার মন্ত্রণাও সিদ্ধাচার্যগণ দিয়েছেন। নানাপ্রকার নৌকা এবং নৌকার সাজ-সরঞ্জামের উল্লেখ চর্যাপদে আছে। আবার কেউ কেউ পুণ্যের লোভে ছোট নদী বা খালে সাঁকো তৈরি করে দিত। গাছ ফেড়ে তক্তা জুড়ে এই সাঁকো তৈরি করা হত। চাটিল্লের একটি পদে -

> ‘‘ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
> পারগামী লোঅ নিভর তরই।।’’
> (৫-সংখ্যক চর্যা)

ডোমেরা বাঁশ দিয়ে চাঙাড়ী এবং নল দিয়ে পেটরা তৈরি করত। আজও ডোম জাতির মধ্যে এরূপ জীবিকা অর্জনের প্রথা প্রচলিত আছে। ডোমদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ছিল, যারা নাচ-গান এবং দেহ ব্যবসার দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। কাহ্নপাদের একটি পদে এরূপ আভাস আছে –

> ‘‘কাহ্নে গাই তু কাম চণ্ডালী।
> ডোম্বী তো আগলি নাহি ছিনালী।।’’
> (১৮ সংখ্যক চর্যা)

চর্যাপদে তৎকালীন সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা নানাবিধ ক্রিয়াকর্মে উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের চিত্র পাওয়া যায়। সেকালেও খুব ধূমধাম করে বাজনা বাজিয়ে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সাধকের নির্বাণ এবং সেই কারণে মহাসুখলাভের কল্পনাটি কাহ্নের ডোম্বী বিবাহ এই রূপকের মাধ্যমে কাহ্নপাদ প্রকাশ করেছেন। তত্ত্বগত অর্থ যাই হোক বিবাহের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর এই পদটিতে –

> ‘‘জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
> কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ।।

ডোম্বী বিবাহিআ আহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ অণুত্তর ধাম।।"
(১৯ সংখ্যক চর্যা)

আমোদ-প্রমোদ হিসেবে দাবা খেলা, নাচ, গান প্রভৃতির প্রচলন ছিল। দাবা খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। দাবার ছককে পীঢ়ি বলা হত। রাজার নাম ছিল ঠাকুর। তাছাড়া মন্ত্রি (মতি), গজ (গঅ) এবং ব'ড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃত্যগীত তৎকালীন সমাজে চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায় ছিল। নাট্যাভিনয়ও সম্ভবত সেই সময়ে প্রচলিত ছিল –

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।"
(১৭ সংখ্যক চর্যা)

চর্যাপদে সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজ চিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের পূজা-অর্চনা এবং ধনীদের জীবনযাত্রার কিছু কিছু আভাসও রয়েছে। ধনীরা গৃহে দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করত। তাদের ঘরে সোনা, রূপার ব্যবহার ছিল। ধার্মিক লোকেরা ধর্মীয় গ্রন্থপাঠ, ইষ্ট মন্ত্র জপ এবং কোশাকুশি নিয়ে পূজা করত।

চর্যাপদে সমাজের বিভিন্ন স্তরের চিত্রই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। চর্যাকারগণ সমাজসচেতন শিল্পী ছিলেন কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁরা তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়েও যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন সমাজ চিত্র দান করেছেন সেগুলিকে একত্রিত করলে একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজের চিত্রই ফুটে ওঠে।

চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য –

চর্যাগুলি সিদ্ধাচার্যদের সাধনতন্ত্রের গুহ্য সংকেত। সিদ্ধাচার্যরা বিশেষ সাধন পদ্ধতিই এই চর্যাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে যে অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা রয়েছে চর্যাগুলির ভাবে ও ভাষায় সেইরূপ বোঝা-না-বোঝার একটা অস্পষ্ট রহস্যময়তা বর্তমান। একেই তত্ত্ব সর্বত্র বোধগম্য নয়, তার উপরে ভাষার অনধিগম্যতায় চর্যাগুলি রহস্যাবৃত হেঁয়ালির মতো প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বের অস্পষ্টতা ও ভাষার দুর্বোধ্যতার আবরণ ভেদ করে চর্যাগুলির রসোপলব্ধি বেশ কষ্ট সাপেক্ষ। তবে তত্ত্ব ও ভাষার জটিলতা ভেদ করে চর্যাগুলির অন্তরে প্রবেশ করতে পারলে একটা অপূর্ব রসাস্বাদন ঘটে।

প্রাচীন যুগের এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে তৎকালীন আদিবাসী মানুষের জীবন ও সমাজ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের জীবন ও জীবিকা, পারিবারিক জীবন এবং এই জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম, আমোদ-প্রমোদের চিত্র কত সুন্দর রূপে চর্যার কবিগণ অঙ্কন করেছেন। তত্ত্বাশ্রিত সাহিত্য মাঝে মাঝে জীবনমুখী হয়ে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। স্থানে স্থানে বর্ণনার চিত্রময়তা পাঠকের মনে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে শবরীপাদের একটি পদ অতুলনীয় –

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।"
(২৮ সংখ্যক চর্যা)

– উচ্চ পর্বতোপরি শবরী বালিকার বাস। তার খোঁপায় ময়ূরের পাখা, গলায় গুঞ্জার মালা।

নীরস ধর্মতত্ত্বগুলিকে রসমণ্ডিত করে তোলবার জন্য চর্যাকারগণ কাব্যকে আদিরসাত্মক করে তুলেছেন। সিদ্ধাচার্যদের সাধনার মূল কথা হল শূন্যতা (নির্বাণ) লাভ। এই শূন্যকে নারীরূপে (ডোম্বী, শবরী, নৈরামণি, মেহেরী, যোগিনী) কল্পনা করায় কাব্যে প্রচুর পরিমাণে আদিরস সিঞ্চন করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্যগণের ধর্মতত্ত্বগুলি আদিরসের সিঞ্চনে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে –

"তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেম্হ রাতি পোহাইলী।।"
(২৮ সংখ্যক চর্যা)

– অর্থাৎ আধুনিক বাংলায় রূপান্তর করলে অর্থ হয়, তিন ধাতুর খাট পাতা হল, শবর মহাসুখে শয্যা ছাইল বা বিছাল; শবর ভুজঙ্গ (নাগর, লম্পট) নৈরামণি দারী (নাগরী, বেশ্যা) বা রমণী প্রেমে রাত কাটাল। গুহ্যার্থ হল – নরনারীর মিলনের উপকরণ খাট, শয্যা, কর্পূর, তাম্বুল প্রভৃতি। এখানে চিত্ত (বা কায় বাক্‌চিত্ত) হল খাট, মহাসুখ হল শয্যা। সহজানন্দকে পেতে গেলে চিত্তের বিভিন্ন বিকারকে অবহেলা করতে হবে, নৈরাত্মাকেই প্রধান লক্ষ্য বলে একমন হতে হবে।

নির্বাণকে নারীরূপে কল্পনা করায় এবং তাকে লাভ করবার ব্যাকুলতা কাব্যকে অনেকটা গীতিপ্রবণ করে তুলেছে। নির্বাণ লাভ করা সহজ নয়। এই না পাওয়ার বেদনা কবির মনে বিরহ বেদনার সৃষ্টি করেছে। বিরহজনিত এই রোমান্টিক বেদনা বিলাস কাব্যে

গীতিরসের সঞ্চার করেছে এবং কাব্যকে অধিকতর প্রাণস্পর্শী করেছে। যেমন –

''জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।।''
(৪ সংখ্যক চর্যা)

– অর্থাৎ যাকে লাভ করতে না পারলে ক্ষণেকের জন্যও জীবন ধারণ সম্ভব নয় এবং যার নিরন্তর প্রেম বিনা বোধি লাভ সম্ভব নয় তাকে না পেয়ে গভীর অর্ন্তবেদনা এবং হৃদয়ের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে সিদ্ধাচার্যগণের পদগুলিতে। পদগুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা। এগুলি গঠনগত দিক থেকেও গান। কামোদ, গুঞ্জরী, ধানসী, ভৈরবী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, মালসী, মল্লারী প্রভৃতি বিভিন্ন রাগে এগুলি গীত হত। এখানে কবির হৃদয় বিরহীর ভূমিকা গ্রহণ করায় কবির ব্যক্তিপুরুষের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে এবং সার্থক গীতিধর্মী কবিতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

চর্যাপদ বাংলার প্রাচীনতম কাব্যসৃষ্টি। তাই ছন্দ সুষমার দিক থেকে কাব্য যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে তা বলা চলে না। তবুও স্থানে স্থানে ছন্দ মাধুর্য কাব্যকে গতিদান করেছে, বিশেষ করে 'পাদাকুলক' ছন্দের ঝংকার কাব্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। যেমন, ১ সংখ্যক চর্যা –

২ ২	১ ১ ১ ১	২ ১ ১	২ ২	
কা আ	ত রু ব র	প ঞ্চ বি	ডা ল।	৪+৪+৪+৪
১ ২ ১	২ ২	১ ১ ২	২ ২	
চ ঞ্চ ল	চী এ	প ই ঠো	কা ল।।	৪+৪+৪+৪

এই পাদাকুলক ছন্দই প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের প্রধান ছন্দ। কেউ কেউ পজ্ঝটিকাকে পাদাকুলকের নামান্তর মনে করেন। পাদাকুলক ছন্দের ১৬ মাত্রার স্থলে ১৪ মাত্রা ধরে এর দীর্ঘস্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনকে ১ মাত্রা ধরে মধ্যযুগের প্রধান ছন্দ পয়ারের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেই অধিকাংশ কাব্য রচিত হয়েছে।

পরিমিত অলংকার প্রয়োগ চর্যাপদগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। যেমন –

অনুপ্রাস ঃ ''জিম জিম করিণা করিণিরে রিসই।
তিম তিম তথতা মঅগল বরসই।।''
(৯ সংখ্যক চর্যা)

এখানে প্রথম চরণের আদ্য শব্দ 'জিম জিম'-র সঙ্গে দ্বিতীয় চরণে আদ্য শব্দ 'তিম তিম'-র অনুপ্রাস।

শ্লেষ ঃ '' সোণে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।''
(৮ সংখ্যক চর্যা)

এখানে 'সোনে' - অর্থ স্বর্ণে, অন্য অর্থ শূণ্যতা। আবার 'রূপা'-র দুটি মানে রৌপ্য এবং রূপের জগৎ।

সমাসোক্তি ঃ ''ফিটেলি অন্ধারীরে আকাশ ফুলিআ।''
(৫০ সংখ্যক চর্যা)

– অর্থাৎ আকাশ-কুসুমের মতো অন্ধকার ছুটে পালাল। সমাসোক্তি হল অচেতন বস্তুর উপর চেতন বস্তুর ব্যবহারের কল্পনা। অন্ধকার অচেতন বস্তু, কিন্তু ছুটে পালাচ্ছে চেতন বস্তুর মতো।

– নানাপ্রকার প্রবাদ প্রবচন ও হেঁয়ালির ব্যবহার চর্যাপদে দেখা যায়। যেমন – 'আপনা মাসে হরিণা বৈরী' (আধুনিক বাংলায় – আপন মাংসে হরিণ বৈরী), 'বরসুণ গোহালী কিম দুট্‌ঠ বলন্দে' (আধুনিক বাংলায় – দুষ্টু এঁড়ের চাইতে শূন্য গোহাল ভালো)।

চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করতে হলে স্বভাবতই লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে পরবর্তী ভাষা ও সাহিত্যকে চর্যাপদ কতটা প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। চর্যাপদের ভাষাই যে আধুনিক বাংলার পূর্বসূরী একথা পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত। পরবর্তী সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনায় চর্যার প্রভাব বিদ্যমান। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার চর্যার প্রভাবজাত। কারণ বিরাট কলেবর সংস্কৃত সাহিত্যে অন্ত্যানুপ্রাস দুর্লভ কিন্তু জয়দেব তাঁর সংস্কৃত কাব্যে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। জয়দেবের ছন্দও স্থানে স্থানে চর্যাপদের ছন্দের অনুরূপ। যেমন –

'গীতগোবিন্দ' ঃ 'ধীর সমীরে। যমুনা তীরে।বসতি বনে বনে।মালী।'
চর্যাপদ ঃ 'উঁচা উঁচা। পাবত তহিঁ।বসই সবরী।বালী।'

এছাড়া চর্যাপদের ন্যায় 'গীতগোবিন্দে'র গীতগুলিতে মালব, ভৈরবী, বসন্ত, গুজ্জরী, কর্ণাট, রামগিরী প্রভৃতি রাগরাগিনীর উল্লেখ

দেখা যায়। এই রাগিণীর উল্লেখ বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যেও লক্ষ করা যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বৌদ্ধগানের শূন্যতা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ও পদাবলীর ‘রাধা’-তে পরিণত হয়েছে।

অতীন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর ‘চর্যাপদ’ - নামক গ্রন্থে চর্যাপদে সনেটের পূর্বাভাস রয়েছে বলে মনে করেন। সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চৌদ্দো পংক্তিতে কবির মনের ভাব সুষ্ঠু এবং নিটোলভাবে প্রকাশ পাবে। চর্যাপদেও কয়েকটি পদ বিশেষ করে ১২, ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক পদগুলি চৌদ্দো পংক্তিতে সম্পূর্ণ। অধিকাংশ চর্যাপদ দশ পংক্তিতে সমাপ্ত।

অবশ্য সনেট পাশ্চাত্য প্রভাবজাত সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের সৃষ্টি। শুধু চৌদ্দো পংক্তিতে সমাপ্তিই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়, এতে আট ও ছয়ের ভাগ (Octave এবং Sestet) থাকবে। প্রথম আট পংক্তিতে একটা ভাবের উপস্থাপন এবং পরের ছয় পংক্তিতে উপসংহার। অন্ত্যমিলেরও কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। এইসব রচনা শৈলীর দিক থেকে বিচার করলে সনেটের সঙ্গে চর্যার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই, তবে মনের ভাবকে সংযত সংহত করে একটি ক্ষুদ্র পরিসরে নিটোল ছাঁচে ঢেলে একটি সুষ্ঠু রূপ দানের ক্ষমতা চর্যাকারদের মধ্যে বিখ্যাত সনেট রচয়িতাদের মতোই বিদ্যমান ছিল।

ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার বিচার ছাড়াও চর্যাপদে একটা বিশেষ দিক লক্ষ করা যায়। সাধকেরা সাধনার গুহ্য তত্ত্বই এতে প্রকাশ করেছেন কিন্তু হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতি ও উন্নত রসবোধ এই নীরস পদগুলিকেও রসমণ্ডিত করে পাঠকের হৃদয় সংবেদী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং চর্যাগুলিকে সাহিত্যিক মর্যাদা দান করেছে।

চর্যাপদে ‘সদ্‌গুরু’র ভূমিকা

সাধনার বিষয়ে গুরুর উপরে আত্যন্তিক নির্ভরশীলতাই গুরুবাদের মূল কথা। এই গুরুবাদ বিশেষ কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের আচারিত প্রথা নয়, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ধর্মসাধনাতেই গুরুবাদ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। সমালোচক শশিভূষণ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন –

> “As a matter of fact, this guru-vada may be regarded as the special characteristic, not of any particular sect or line of Indian religion, it is rather the special feature of Indian religion as a whole.”
>
> [‘Obscure religious cults, appenix (A)’]

ভারতীয় ধর্মসাধনায় গুরুবাদের এই প্রাধান্যের কারণ, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে পরম সত্যকে সাধারণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অবাঙ্‌মনসগোচর পরম সত্যকে গভীর অনুধ্যান ও বোধির দ্বারা কোনো কোনো ভাগ্যবান পুরুষ আপন অন্তরে সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পান। তাঁকেই সাধারণত ‘গুরু’ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় – সত্যোপলব্ধির জন্য এই গুরুর উপদেশ নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়। এই ভাবে গুরুবাদের উৎপত্তি। ভারতীয় ধর্ম সাধনার প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের বিভিন্ন মরমিয়া-সহজিয়া ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরুকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করা হয়েছে।

বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সম্প্রদায়ও তাদের সাধন পন্থায় এই গুরুবাদকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছেন। চর্যাগীতিতেও তার নিদর্শন সুপ্রচুর। এই স্বীকৃতির কারণ চর্যাকারগণ যে ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তার সাধ্য ও সাধন পদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্যসাধনার বিষয়। আসলে চর্যাকারদের সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম বহুলাংশেই তান্ত্রিক যোগাচার দ্বারা প্রভাবিত। এই তান্ত্রিক যোগাচারে এমন কতকগুলি দুরূহ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে যা পূর্ব-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির নির্দেশ ও সহায়তা ছাড়া অভ্যাস করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সাধ্য লাভের জন্য অন্যান্য তন্ত্রের মতো বৌদ্ধতন্ত্রেও গুরুকে বিশেষ সম্মান ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রের এই গুরুবাদ-সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মানসিকতাই বিভিন্ন চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। পরমসত্য বা সহজানন্দ সম্পর্কে চর্যাকারদের ধারণা এই যে সহজস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগম্য, শাস্ত্র পাঠে অলভ্য – সুতরাং তাঁদের অন্য পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে এবং সেই পন্থা ‘সদ্‌গুরু’ বা ‘সদ্‌গুরুবচন’। আমাদের আলোচ্য চর্যাগীতিগুলির মধ্যে ‘সদ্‌গুরু’র ভূমিকা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে - নিম্নে তা আলোচনা করে দেখানো হল –

চর্যাগীতির প্রথম পদেই আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বলেছেন –

“দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমান।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।”

অর্থাৎ, মহাসুখ লাভ করবার উপায় গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জান।

এরপর পঞ্চম চর্যায় রয়েছে –

“জই তুম্‌হেলোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিলা অনুত্তর সামী।।”

এখানেও বোধিচিত্তকে লাভ করবার জন্য ‘অনুত্তরসামী’ চার্চিলের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গুরু চাটিলের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অষ্টম চর্যায় দেখা যায় ‘সদগুরু’র প্রসঙ্গ –

“বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছী।।”

দ্বাদশ চর্যায় পদকর্তা কাহ্নপাদও উল্লেখ করেছেন –

“করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল।
সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভব বল।।”

– অর্থাৎ, ‘সদ্‌গুরু’র উপদেশে বা বোধে ভব বল জয় করা হল।

এরপর শবরপাদের ২৮ সংখ্যক পদে এসেছে গুরুবাক্যকে অনুসরণ করে নির্বাণ লাভের প্রসঙ্গ–

“গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মনে বাণেঁ।
একে সরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।।”

– এখানে গুরুবাক্যকে বাণ রূপে কল্পনা করে সেই গুরুবাক্যরূপী বাণকে সন্ধান করে নির্বাণকে বিদ্ধ করবার বা লাভ করার কথা এসেছে।

এগুলি ছাড়া ৩৮ সংখ্যক চর্যায় ‘সদগুরু বঅণে ধর পতবাল’, ৪১-সংখ্যক চর্যায় ‘জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদগুরু পাব’ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ‘সদ্‌গুরু’র প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। এভাবে সর্বত্রই সাধন-মার্গে গুরুর অপরিহার্যতা বিশেষভাবে স্বীকৃত। তবে

চর্যাগীতির গুরুবাদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে গুরুকে ‘সহজ’ লাভের উপায় হিসাবেই দেখা হয়েছে, উপেয় বা সহজ স্বরূপের বিকল্প হিসাবে দেখা হয়নি। কেন-না, পরম সাধ্য সহজানন্দ প্রত্যেক সাধকের নিজস্ব অনুভূতির বিষয়। প্রত্যেক সাধক নির্দিষ্ট সাধনমার্গে আরূঢ় হয়ে এই অনুভূতি লাভ করেন। এই অনুভূতি তাঁদের মতে ‘বাক্‌পথাতীত’ বা বাক্যের অগোচর। সুতরাং গুরু তাঁর উপদেশ বাক্যের দ্বারাই সহজানন্দের উপলব্ধিগত অনুভূতি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করতে পারেন না। তিনি উপদেশ-বাক্যের দ্বারা শিষ্যকে শুধু সঠিক পথে চালিত করতে পারেন। সুতরাং গুরুর উপদেশ বাক্য পরম সাধ্য সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা নয়, সহজানন্দ লাভের উপায় নির্দেশ মাত্র। এই সহজানন্দ ভাষণ ও শ্রবণের অতীত – তাই যিনি ‘সদ্‌গুরু’ তিনি সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন না এবং যিনি উপযুক্ত শিষ্য তিনিও সহজ স্বরূপের আত্মগত উপলব্ধির জন্য গুরু বচনকে অক্ষরে-অক্ষরে পালনও করেন না। এই দিক থেকে চর্যাগীতিতে গুরু-শিষ্য বোবা-কালার রূপকে বর্ণিত। কাহ্নপাদের ৪০ সংখ্যক চর্যায় দেখা যায় –

> ‘‘গুরু বোব সে সীস কাল।।
> ভণই কাহ্ন জিণরঅণ বি কইসা।
> কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।।’’

– এখানে বলা হয়েছে, গুরু শিষ্যকে বৃথাই উপদেশ দেন, ‘বাকপথাতীত’ সেই ‘সহজ’ কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? যতই বলা যায়, ততই ভুল হয়। গুরু বোবা-শিষ্য কালা – কাহ্ন বলেন, সেই জিনরত্ন (সহজ) কেমন? কালা বোবাকে বোঝায় যেমন।

এইভাবেই চর্যাগীতিতে নানা প্রসঙ্গে গুরুর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। চর্যাগীতিতে গুরুর প্রসঙ্গ পদে পদে। ‘গুরু সম্প্রদায়াৎ বোদ্ধব্যং’ – নির্মলগিরা টীকার এটি যেন একটি ধ্রুবপদ। যে সকল স্থলে মূল গানে গুরুর উল্লেখ নেই, সেখানেও টীকাকার মুনিদত্ত ‘শ্রী গুরুমুখলব্ধ’ উপায় বা উপদেশের কথা বলেছেন। মূল চর্যাগীতিতে তেরোবার স্পষ্টভাবে ‘গুরু’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। চর্যাগীতিতে গুরুর ভূমিকাগুলি যে যে ক্ষেত্রে উল্লেখ্য সেগুলি নিম্নে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হল –

(i) বজ্রযোগে কায়রক্ষা বা দেহ সাধনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা

(ii) চিত্ত বিশোধনের ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা

(iii) মধ্যমা মার্গে প্রবাহ অভ্যাসে ও চিত্তের বিকরণে গুরুর ভূমিকা

(iv) প্রজ্ঞা - অভিষেকে বা বোধিচিত্তের জাগরণে গুরুর ভূমিকা

(v) সহজানন্দ বা মহাসুখ অনুভবের ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা।

– এইসব বিষয়গুলির প্রেক্ষিতেই চর্যাপদে গুরুর ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে গোপনীয়তা সমস্ত তান্ত্রিকতত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ এবং বৈশিষ্ট্য। তান্ত্রিকদের তত্ত্ব অতিগুহ্য; বাইরের অদীক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট তা অপ্রকাশ্য ও দুর্বোধ্য। শুধুমাত্র দীক্ষিত সাধকই প্রতি পদে ‘সদ্‌গুরু’র প্রসাদে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই তন্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুবাদের প্রাধান্য অবশ্যস্বীকার্য। তেমনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন মার্গেও তাই ‘সদ্‌গুরু’র ভূমিকাই সর্বপ্রধান, আর চর্যাগীতিগুলিতে বারংবার উল্লিখিত ‘গুরু’-প্রসঙ্গ তারই পরিচয় বহন করেছে।

চর্যাপদে উপমা-রূপকের প্রয়োগ ও চিত্রকল্প নির্মাণে কবিদের দক্ষতা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বাংলা পুথি-সাহিত্য সংগ্রহের জন্য তৃতীয়বার ১৯০৭ সালে নেপালে যান। সেখানে তিনি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহবজ্রের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব—এই চারটি পুথি সংগ্রহ করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বা ১৯১৬ খ্রি -এ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চারখানি গ্রন্থ একত্রে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

সাধারণভাবে বলা হয়, এই চর্যাপদগুলি হল বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সাধক বা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনতন্ত্রের গুহ্য সংকেত। সিদ্ধাচার্যরা বিশেষ সাধন পদ্ধতিই এই চর্যাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে ‘সন্ধ্যাভাষা’ বলে অভিহিত করেছেন। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে যে অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা রয়েছে চর্যাগুলির ভাবে ও ভাষায় সেইরূপ বোঝা-না-বোঝার একটা অস্পষ্ট রহস্যময়তা বর্তমান। একেই তত্ত্ব সর্বত্র বোধগম্য নয় তার উপরে ভাষার অনধিগম্যতায় চর্যাগুলি রহস্যাবৃত হেঁয়ালির মতো প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বের অস্পষ্টতা ও ভাষার দুর্বোধ্যতার আবরণ ভেদ করে চর্যাগুলির রসোপলব্ধি বেশ কষ্ট সাপেক্ষ। তবে তত্ত্ব ও ভাষার জটিলতা ভেদ করে চর্যাগুলির অন্তরে প্রবেশ করতে পারলে একটা অপূর্ব রসাস্বাদন ঘটে।

প্রাচীন যুগের এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে তৎকালীন আদিবাসী মানুষের জীবন ও সমাজ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের জীবন ও জীবিকা, পারিবারিক জীবন এবং এই জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম, আমোদ-প্রমোদের চিত্র সুন্দরভাবে চর্যার কবিগণ অঙ্কন করেছেন। তত্ত্বাশ্রিত সাহিত্য তাই কখনো-কখনো কবিদের উপমা-রূপকের প্রয়োগে এবং চিত্রকল্প নির্মাণের দক্ষতায় জীবনমুখী হয়ে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কাব্যের রসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অলংকারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু চর্যাপদে যে অলংকার প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই প্রাচীনতর অলংকার প্রথার প্রভাবমুক্ত ছিল। তাঁদের রচনায় অলংকার চর্চার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য নয় – গুহ্যপন্থী সাধকদের সাধন সংগীত বা তত্ত্বকথাকে কোথাও সমপন্থী সাধকদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য, কোথাও বা অদীক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে গোপন রাখবার জন্য চর্যার কবিরা যে সব কলা-কৌশল অবলম্বন করেছেন তাতেই অলংকারের অভাব ফুটে উঠেছে। রস বা সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় চর্যার অলংকার প্রধানত তত্ত্বের রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই রূপকে-উপমায় সাধর্ম্যের আনুষ্ঠানিক তুল্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু তুলনার মধ্যস্থতায় সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়নি।

চর্যাপদে উপমা-রূপক প্রভৃতি অর্থালংকারের মাধ্যমে অভিপ্রেত বক্তব্যকে ছদ্মরূপ - প্রতিমানের আড়ালে গোপন করা হয়েছে। প্রকৃত তত্ত্ব ও তার ছদ্ম প্রতিরূপকে অলংকারের পরিভাষায় যথাক্রমে উপমেয় ও উপমান বলে চিহ্নিত করা যায়। এই উপমেয়-স্থানীয় তত্ত্ব ও উপমান-স্থানীয় প্রতিরূপ উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য প্রতিষ্ঠাতেই চর্যাগীতির অর্থালংকারের বিকাশ। নিম্নে চর্যার কাব্য-সংগীতগুলির ভিত্তিতে উপমা-রূপকের প্রয়োগ দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করা হল –

চর্যাগীতির প্রথম চর্যা –

“কা আ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।”

—এখানে লুইপাদ যে উপমা-রূপক ব্যবহার করেছেন তা হল – ‘কায়া রূপ তরুবর’ ও ‘পঞ্চেন্দ্রিয়-পঞ্চডাল’। এখানে উভয়ক্ষেত্রে অভেদ কল্পনা করে রূপক অলংকার হয়েছে।

আবার চাটিলপাদের পঞ্চম চর্যায় ‘ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ’ – এর মধ্যেও মোহরূপ তরুকে ছেদন করার কথা বলা হয়েছে রূপক অলংকারের মধ্য দিয়ে। এছাড়া আছে অদ্বয়-টাঙ্গী, পাটি জোড়া দেওয়া, সাঁকো তৈরির রূপকও।

ভুসুকুপাদের ষষ্ঠ চর্যার মধ্যে –

“হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জানী
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।।”

– এখানে ‘হরিণা-হরিণী’ যথাক্রমে সাংবৃত্তিক ও পারমার্থিক চিত্তের রূপক রূপে কল্পিত। এই রূপক-কল্পনায় পরপর আরো কতকগুলি অনুষঙ্গী রূপকের সৃষ্টি করেছে। এই অনুষঙ্গী রূপকগুলি কার্যকারণ ভাবের পরম্পরার দ্বারা সংঘবদ্ধ। তাই এগুলি সমস্তই পরম্পরিত রূপকের নিদর্শন।

চর্যাগীতির অষ্টম চর্যায় কম্বলাম্বরপাদ নৌচালনার রূপকে সাধনতত্ত্বের ইঙ্গিত করেছেন। এখানে –

“সোনে ভরিলী করুণা নাবী
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।”

– এর মধ্যে করুণা রূপ নৌকার প্রসঙ্গ এসেছে।

১০ সংখ্যক চর্যায় কাহ্নপাদ ডোম্বীর রূপকে সিদ্ধাচার্যের পরম-কাঙ্ক্ষিত সহজানন্দের কল্পনা করেছেন।

১২ সংখ্যক চর্যাতে পদকর্তা কাহ্নপাদ দাবা খেলার রূপকে তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন –

''পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।''

আবার বীণাপাদের ১৭ সংখ্যক পদটিতে এসেছে বীণা বাদনের রূপক – সেখানে 'সুজ লাউ', 'আলি-কালি' প্রভৃতি উপমা-রূপক ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার চর্যার ২৮ সংখ্যক পদে শবরপাদ শবর-শবরীদের জীবনযাত্রার একটি মিলন মধুর চিত্রের রূপকে তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন –

''তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।।''

এখানে শর সন্ধানের উপমায় পরম নির্বাণ লাভের বিষয়টি তুলনা করা হয়েছে। শবরপাদের ৫০ সংখ্যক চর্যাতে –

''গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাহী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।।''

– এর মধ্যেও শবর-শবরীর মিলনমত্ততার রূপকে শূন্যতার সর্বশেষ পরিশুদ্ধ স্তর সবশূন্যে উপনীত হয়ে চতুর্থানন্দরূপে মহাসুখলাভের কথা বর্ণিত হয়েছে।

আসলে চর্যার পদকর্তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিগূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশ করার জন্য সম্পূর্ণ পদেই উপমেয়-উপমান সম্পর্ক উপস্থাপিত করে আলংকারিক অবকাশকে সম্প্রসারিত করেছেন। উপমেয়-উপমানের এই সম্পর্ক – উপমাও অনেকাংশেই রূপক অলংকারের পরিপোষক হয়ে উঠেছে।

আধ্যাত্মিকতা বা সাধনতত্ত্ব চর্যার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এর স্থানে স্থানে বর্ণনার চিত্রময়তা বা রূপকল্প এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে পাঠকচিত্তে যার আবেদন চিরকালীন রসের ভূমিতে। এরূপ কতকগুলি চিত্রে দেখা যায় – তৎকালীন জীবনের কিছু কিছু পরিচয় যেমন, শিকারের চিত্র, নৌকা চালনার চিত্র, মদ্যবিক্রয়শালার চিত্র ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় – চাটিলের ৫ সংখ্যক চর্যায় নদীপ্রবাহ ও নদীপার হওয়ার বর্ণনাটি –

''ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিডর তরই।।''

কতকগুলি চিত্র আছে, যেগুলির সার্বজনীন সাহিত্যিক মূল্য ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও অস্বীকার করা চলে না। চিত্র সৌন্দর্যের দিক থেকেও সেগুলি যেমন উপভোগ্য, তেমনি উপভোগ্য সেগুলির পশ্চাতে থাকা পরিপূর্ণ সুখের আশায় যে উন্মুখ চিত্ত তার গভীর আকুতি। যেমন - শবরপাদের ২৮-সংখ্যক পদে শবর-শবরীর মিলনের পরিপূর্ণ চিত্র সত্যই অনবদ্য –

''উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী।।''

কিংবা ৫০ সংখ্যক চর্যাতেও রয়েছে শবর-শবরীর আনন্দে মত্ত মিলন চিত্র –

''ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষমো দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী।।
হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
ষুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।।''

– এই যে সমস্ত চিন্তা-উদ্বেগ-নির্মুক্ত অবস্থায় শূন্য-রূপ নারী মহলে প্রিয়ার কণ্ঠাশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান, বাড়ীর পাশে নীচে কাপাস ফুল ফুটে আছে – এ চিত্রের কাব্যোৎকর্ষ উপেক্ষণীয় নয়।

আবার ভুসুকু পাদের ষষ্ঠ পদে পাওয়া যায় ঘন-বনে হরিণা-হরিণীর চিত্র –

‘‘আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।।
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই না পানী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী।”

কিংবা ১০ সংখ্যক চর্যায় কাহ্নুপাদের ডোম্বী রমণীর প্রতি প্রেম নিবেদনের চিত্রও বেশ আনন্দদায়ক –

‘‘আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্নু কাপালী জোই লাগ।।
এক সো পদমা চৌসট্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।”

আর ৮ সংখ্যক ও ৪৯ সংখ্যক চর্যা দুটিতে রয়েছে নৌ-চালনার চিত্রকল্প। যেমন – অষ্টম চর্যায় দেখা যায় –

‘‘সোনে ভরিলী করুণা নাবী
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।”

কিংবা উনপঞ্চাশতম চর্যায় রয়েছে –

‘‘বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ।।
… … … … … … … … … … … … … … …
ডহি জো পঞ্চ পাটণ ইন্দিবিসআ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা।।”

– এই যে নৌকা বাওয়ার চিত্র কল্পনা ও তার বিভিন্ন অনুষঙ্গের বর্ণনা তা সত্যিই অনবদ্য।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তু যত আধ্যাত্মিকই হোক-না-কেন তাকে প্রকাশ করবার জন্য যে সকল রূপকল্প ও চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে তা এক অর্থে ব্যবহারিক জীবনের অতি পরিচিত বিভিন্ন বিষয়-প্রসঙ্গ। এইভাবেই চর্যার কাব্য-সংগীতগুলির মধ্যে চর্যার কবিরা উপমা-রূপকের প্রয়োগ নৈপুণ্যে ও চিত্রকল্প নির্মাণের দক্ষতা প্রদর্শন করে চর্যাগীতিগুলির সাধন-তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির কাব্যিক তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত কাব্য সৌন্দর্যও সৃজন করেছেন অনন্য সাধারণ ভঙ্গিমায়।